বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছিঃ

ঘুরে এলাম মংগার দেশ থেকেঃ ৩

*অজয় রায়**

অবহেলিত রৌমারী

আমাদের মুক্তিযুদ্ধে রৌমারীর গৌরবোজ্জল ভুমিকা থাকলেও, বাংলাদেশের অধিকথশ মানুষই জানেনা এর ভুমিকার কথা, এবং কোথায় এর অবস্থান। রৌমারী আজও অবহেলিত এলকার নিদর্শন হিসেবে উপস্থিত। শিরনামে বলেছি মংগার দেশ ঘুরে এলাম, তবে মংগা দেখতে নয়। তবুও মংগার চিহ্ন অস্স্লষ্ট থাকে নি, গরীড়্গা ক্লিষ্ট মানুষদের মুখ দেখলেই বোঝা যায় বন্যায় সদা নিপীড়িত মানুষগুলো সুখে নেই, আছে অন্ন কষ্টে, আছে আকাল আর অভাব, মংগা বা অন্য যে কোন নামেই ডাকা হোক। সরকার অবশ্য এর অস্তিত্ব অস্বীকার করে চলছেন এই বলে যে এসব জনপ্রিয় জোট সরকারকে হেয় করার উদ্দেশ্যে বিরোধী দলের কুৎসা-রটনা। এর দ্বারা সরকার বলতে চাইছেন যে ড. কামাল হেসেন সহ যেসব জাতীয়ি নেতৃবৃন্দ সেসব অঞ্চলে 'মঙ্গাবস্থা' দেখেছেন তাঁরা মিথ্যেবাদী।

স্কুলের অনুষ্ঠানে বক্তৃতারত আজিজুল হক, রৌমারীর একজন গণমান্য ব্যক্তি, অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক, এবং মুক্তিযোদ্ধা।

কোথায় এই রৌমারী ? এখানে বলে রাখা ভাল আমরা রৌমারী বলতে সাবেক রৌমারী নামে পরিচিত বৃহৎ চরাঞ্চলটিকে বোঝাচ্ছি, যা বর্তমানে রৌমারী ও রাজিবপুর এ দুটি থানায় বিভক্ত। কয়েক বছর আগেও এ সমগ্র অঞ্চলটি রৌমারী উপজেলা হিসেবে পরিচিত ছিল। এই ভুখণ্ডটি ২৫°২২' ও ২৫°৪৪' উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৯°৪৪' ও ৮৯°৫৩' দ্রাঘিমাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ। আশেপাশের ছোট বড় সব চর মিলিয়ে এর আয়তন মোটামুটি ৩৩৪ বর্গ-কিলোমিটার অর্থাৎ ১২০ বর্গমাইল এবং বর্তমান লোকসংখ্যা দু লক্ষকেও ছাড়িয়ে গেছে। পুরো অঞ্চলটিই বিভিন্ন সময়ে জেগে ওঠা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চর ক্রমশ জোড়া লেগে রৌমারী নামের এই বৃহৎ ভুখণ্ড গড়ে উঠেছে গত ৩০০ বছরের'ও অধিক কাল ধরে। একথা বোঝার জন্য ভূতাত্ত্বিক হওয়ার প্রয়োজন নেই সাদা চোখেই বোঝা যায় - সারা অঞ্চলের অনেক গ্রাম - ইউনিয়নের নামের সাথে যুক্ত হয়ে আছে চর শব্দটি-- চর রাজীবপুর, চর শৌলমারী, চর বোয়ালমারী, চর ফুলবারী, চর খেদাইমারী, যাদুর চর, কুঠির চর, বাঙ্গার চর, বেহুলার চর, টাপুর চর, ধনার চর, পালের চর, ফুলুয়ার চর ইত্যাদি। কাশফুল, বিন্যা আর নল-খাগরা সহ বিভিন্ন জাতের বন্য ঘাস-বাঁশ জাতীয় ওষুধি বনে অগম্য ছিল এসব এলাকা। জন বসতি ছিলই না বলে চলে একশত বছর আগেও।

ক) বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ স্কুল ভবন খ) পুনর্নির্মিত স্কুল ভবন

কবে ইতিহাসের কোন লগ্নে এ এলাকা জন-মানুষের পদচারণায় ধ্বনিত হয়েছিল এবং সভ্যতার স্পর্শে এসেছিল-- তা হতে পারে ইতিহাসের গবেষণার বিষয়। এখানকার মানুষ বলে ব্রহ্মপুত্র-জিঞ্জিরাম-সোনাভারি-হলহলিয়া নদী বিধৌত এই রৌমারীর ইতিহাস এ সব নদীর সাথে জড়িয়ে আছে। কালিকা পুরাণে সুবর্ণশ্রী বা স্বর্ণবহা নামে যে নদীর কথা উলিখিত হয়েছে তা হয়তো বর্তমানের সোনাভরি নদী। এই সুত্র ধরে অনুমান করা যেতে পারে অতীতে রৌমারী কামরূপের অর্ন্তগত ছিল। কামরূপ রাজ্য তৎকালে চারটি পীঠে বিভক্ত ছিল, তন্মধ্যে রংপুরাদি জেলা ও ব্রহ্মপুত্রের পাশ ঘেষে আসাম-মেঘালয়ের কিছু অঞ্চল নিয়ে গঠিত এলাকাটির নাম ছিল 'রত্নপীঠ'। কথিত আছে ঐতিহাসিক কালে মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের সেনাপতি ও বাংলার সুবেদার মীরজুমলা ১৬৬২ সালে এই রৌমারীর মধ্যদিয়েই কালং নদী অতিক্রম করে আসাম অভিযান করেছিলেন। বর্তমানে মেঘালয়-রৌমারী সীমান্তের কাছ দিয়ে প্রবাহিত নদীটির নাম কালা নদী। আসাম অভিযান শেষে প্রত্যাগমন কালে রৌমারী থেকে খুব নিকটে সীমান্তের ওপারে মানকার চরে মীরজুমলার হঠাৎ করেই জীবনাবসান ঘটে। তাঁকে নিকটবর্তী একটি পহাড়ী টিলায়, যে টিলাটি রৌমারী থেকে দেখা যায়, সমাধিস্ করা হয়। মানকার চর শুধু আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সাথে জড়িত একটি প্রিয় নাম নয়, ১৯৪৭ পুর্বকালে মৌলানা

ভাসানীর বিভাগপুর্ব রাজনীতির ক্রীড়াভুমি। সে সময় মানকার চর ভারতের অন্তর্ভুক্ত হলে, রৌমারীর মানুষ দেশীয় অস্ে সজ্জিত হয়ে মানকার চর দখল করতে গিয়েছিল দলে দলে। সেখানে মৌলানা ভাসানী গড়ে তুলেছিলেন 'পাকিস্তান কেলা' নামে একটি জঙ্গী সংগঠন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে মুক্তিযোদ্ধাদের দখলকৃত দুটি ছোট লঞ্চ রৌমরী লঞ্চঘাট থেকে মানকার চর খেয়াঘাটে নিয়মিত যাতায়াত করত পণ্যবহন, সাধারণ যাত্রী ও মুক্তিযোদ্ধাদের যাতায়াত ও সামরিক কাজের জন্য। এক কথায় মানকার চর ছিল আমাদের সে সময় ট্রানজিট পয়েন্ট বা অতিক্রমণ বিন্দু। এ পথ দিয়েই টাঙ্গাইল, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম প্রভৃতি এলকার মুক্তিযোদ্ধারা ১১ নং সেক্টরের প্রধান কার্যালয়ের সাথে যোগাযোগ রাখতে পারত।

যতদুর জানা যায় অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ থেকেই এই পাণ্ডব বর্জিত কাশ-বিন্যা-নলখাগরা শোভিত দেশে জন বসতি শুরু হয়। বোধ্য কারণেই ধুবরী-গোয়ালপারা-কামরূপ এড়্গাং গাইবান্ধা-কুড়িগ্রাম প্রভৃতি এলাকার বাংলাভাষী মানুষ এবং মেঘালয়ের গারো পাহাড় ঘেষা সীমান্ত অঞ্চল থেকে আরণ্যক মানুষ প্রথম দিকে রৌমারী এলাকায় বসতি স্থাপন করে। কুড়িগ্রাম ও আসাম থেকে বেশ কিছু মুসলিম অধিবাসীও এখানে এসে স্থায়ী বসত গড়ে তোলে। এদের উত্তর পুরুষেরা পরবর্তীকালে 'শেখ সম্প্রদায়' নামে পরিচিত হয় এবং রৌমারীর জনজীবনে উলেখযোগ্য প্রভাব রাখে। আর আছে নদীর সাথে ষংগ্রাম করে মাছ ধরে জেলে সমপ্রদায়। অতঃপর ব্যবসা বাণিজ্য ও নানাবিধ উদ্দেশ্যে নানা পেশার মানুষ এসেছে। ধীরে ধীরে কাশ-বিন্যার বুক চিরে গড়ে উঠেছে জন বসতি। পাবন, বন্যা, চর, অরণ্য এসব কারণে এখানকার মানুষ স্বভাবতঃই সংগ্রামী। কোম্পানী আমলে বাংলাদেশের বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলের মত এখানেও শ্বেতকায় নীলকররা নীল চাষ শুরু করে কৃষকদের ওপর অত্যাচারের মধ্য দিয়ে। রৌমারীর সংগ্রামী মানুষ এর বিরুদ্ধে বাংলা ১২৫২ (১৮৪৫-৪৬) সালে বিদ্রোহ করে- যা রৌমারীর জনগণের স্মৃতিতে 'বাহান্নর' বিদ্রোহ রূপে জাগরুক। জানা যায় কৃষকদের এই বিদ্রোহকে সংগঠিত ও নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ভাদু ব্যাপারী ওর তার ভাই।

মোগল আমলে সুবে বাংলা ১৩ টি প্রশাসনিক এককে অর্থাৎ চাকলায় বিভক্ত ছিল। তৎকালীন বাংলাদেশের উত্তর পুর্বাঞ্চলে ২৫টি পরগণা নিয়ে গড়ে উঠেছিল কড়াইবাড়ী চাকলা; এর মধ্যে মধ্যে বাহারবন্দ পরগনার অন্তর্ভুক্ত ছিল রৌমারী। নবাব সিরাজদ্দৌলার আমলে বা তার পুর্ব থেকে সমগ্র রংপুর সহ রৌমারী অঞ্চল নাটোরের মহারানীর জমিদারীর অন্তর্গত রংপুর ফৌজদারীর অধীনে ছিল। পলাশীর যুদ্ধের (১৭৫৭) পর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সুবে বাংলার দেওয়ানী লাভ করলে এ অঞ্চল নতুন বন্দোবস্তের মাধ্যমে কাশিমবাজার জমীদারের অধীনে আসে। এই ব্যবস্থা ব্রিটিশদের ভারত ত্যাগ (১৯৪৭) পর্যন্ত টিকে ছিল। প্রশাসনিকভাবে রৌমারী কোন কোন সময় বৃহত্তর মৈমনসিংহ জেলার সাথেও যুক্ত হয়েছিল। কিন্তু এসব ব্যবস্থা ছিল ক্ষণস্থায়ী। ১৮৭৫ সালে কুড়িগ্রাম মহকুমা সৃষ্টি হলে স্বাভাবিকভাবেই রৌমারী সহ সমগ্র বাহারবন্দ পরগনা কুড়িগ্রাম মহকুমার অধীনে চলে আসে। এ ব্যবস্থা মোটামুটি তখন থেকেই পাকাপোক্ত হয়ে যায়। কাশিমবাজার রাজাদের শাসনের অনেক স্মৃতি ও স্থাপনার নিদর্শন জরাজীর্ণ অবস্থায় ইতস্ত ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। তবে অচিরেই তা স্মৃতি থেকে মুছে যাবে, কালের গর্ভে বিলীন হয়ে যাবে এ সব ধ্বংসোন্মুখ কীর্তি কেন্দ্রগুলো। কাশিমবাজার জমিদারের শেষ রাজা শ্রীশ চন্দ্র নন্দী ও মহারাণী স্বর্ণময়ীর এতৎ অঞ্চল পরিদর্শনের কথা অনেক বৃদ্ধজনের স্মৃতিতে কিছুটা ধরা থাকলেও পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তা ধুসর হয়ে গেছে।

রৌমারী নাম নিয়েও বেশ জল্পনা কল্পনা রয়েছে। একশ্রেনীর বড় মাছকে বাংলায় আমরা বলি রুই; একে

আসাম-রংপুরাদি অঞ্চলে রৌ বলা হয়। শ্রীহট্ট জেলাতেও রৌ বলা হয়। ড. মুহম্মদ শহীদুলার মতে এই দুটি শব্দই সংস্কৃত 'রোহিত' শব্দ থেকে উদ্ভুত। (দ্রষ্টব্য *বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান*, ড. মুহম্মদ শহীদুলাহ সম্পাদিত, ১ম খণ্ড, ২য় অংশ, বাংলা একাডেমী, ১৯৬৫, পৃ ৪২১, ৪২৫)। দিনাজপুর অঞ্চলে র"ই মাছকে 'র"হি বা রোহি' মাছও বলা হয় এবং কুমিলাদি সহ পুর্ববঙ্গে এর নাম 'র"ইত' মাছ। এ থেকেই স্বাভাবিক অনুমিতি যে এককালে এ অঞ্চলে প্রচুর র"ই মাছ পাওয়া যেত এবং ধরা (মারা) হতা এবং তা থেকেই এই বিশাল চরের নাম হয়েছে রৌমারী। এর সমর্থনে বলা যায় 'মাছ মারা' সংযুক্ত অনেক স্থানের নাম এ এঞ্চলে রয়েছে যেমন– শৌলমারী, বোয়ালমারী, বাইমমারী, বাউশমারী, বাইটাকামারী, কর্তিমারী, ইজলামারী, শিঙ্গিরমারী ইত্যাদি। পুরানো অনেক দলিল পত্রে এর পোষাকী নাম 'রহুমারী বা রাহুমারী' উলেখ কত্মা হয়েছে।

খেদাইমারী স্কুলের পুনর্নির্মান অনুষ্ঠানে আগত জনগণের একাংশ

১৯১২ সালে রৌমারী থানা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে, -এর আগে এটি চিলমারী থানার মধ্যে ছিল। সে সময় থানা সংশিষ্ট অধিকর্তাদের বাসগৃহ সহ একটি চমৎকার থানা কমপেক্স নির্মিত হয়- যা ছিল তৎকালীন বঙ্গদেশের থানাগুলোর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। মনে হয় থানা কমপেক্স ভবনটিই রৌমারীর প্রথম ইটনির্মিত ভবন। বিভিন্ন সময়ে নানারকম সংস্কার সত্তেও এই ঐতিহাসিক ভবনটি এখনও টিকে আছে থানা কার্যালয় হিসেবে। ১৯৭৭ সালে রাজীবপুর, কোদালকাটি, ও মোহনগঞ্জ এ ৩টি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত হয় স্বতন্ত্র রাজীবপুর থানা। বর্তমানে রৌমারী থানায় রয়েছে ৫টি ইউনিয়ন - এগুলো হ'ছে দাঁতভাঙ্গা, শৌলমারী, বন্দবেড়, রৌমারী ও যাদুরচর।

১৯৪৭' এর দেশ বিভাগের পর রৌমারী এলাকায় জনবসতির তাৎপর্যময় রূপান্তর ঘটে। হিন্দু অধিবাসীরা, যাদের অধিকাংশই ছিল ভাষা ও সংস্কৃতির দিক থেকে ধুবরী ও গোয়ালপারার অধিবাসীদের সাথে নৈকট্য, আসাম বা ভারতের অন্য অঞ্চলে চলে যায়। কিন্তু রেখে যায় তাদের ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের স্থায়ী ছাপ। বিভাগোত্তর

কালে পাবনা, সিরাজগঞ্জ, টাঙ্গাইল, মৈমনসিংহ, বিশেষ করে জামালপুর-দেওয়ানগঞ্জ এলাকা থেকে বিপুল মানুষ নানা উপলক্ষ্যে রাজীবপুর, রৌমারী অঞ্চলে এসে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করে। ফলে একদিকে যেমন ভাষা-সংস্কৃতি-অচার-আচরণ গত তারতম্যের ফলে 'স্থানীয়' ও 'বহিরাগত' জনের মধ্যে উদ্ভুত হয়েছে দ্বন্দ্ব অন্যদিকে এই দুই শ্রেণীর মানুষের মধ্যে সংমিশ্রন ও মেল বন্ধনের (রহঃবৎসরহমষরহম) ভেতর দিয়ে গড়ে উঠেছে মিশ্র ও জটিল সংস্কৃতি এবং ভাষা। সমাজ বিজ্ঞানী ও ভাষাবিজ্ঞানীদের গবেষণার জন্য রৌমারী রাজীবপুর হতে পারে একটি আদর্শ স্থান। উত্তর দিক থেকে অর্থাৎ আসাম-মেঘালয়, এবং কুড়িগ্রাম-গাইবান্ধা-রংপুরাদি অঞ্চল থেকে স্মত্মণাতীতকালে আসা প্রথমদিকের আদিবাসীদের বলা হয় 'উজানী' অর্থাৎ উজানের দেশ থেকে আসা মানুষ; এরা আদি ও স্থানীয় বাসিন্দা হিসেবে চিহ্নিত। অন্যদিকে ব্রহ্মপুত্র-যমুনার নিম্ন অববাহিকার অর্থাৎ ভাটির দেশ থেকে আগত (যেমন টাঙ্গাইল, জামালপুর) মানুষদের বলা হয় 'বহিরাগত' এবং এরা 'ভাটিয়া' নামে পরিচিতি লাভ করেছে। বস্তুত রৌমারীতে পাবনা-সিরাজগঞ্জ এলাকার নিম্ন বরেন্দ্রী ভাষার মানুষ, মৈমনসিংহ-টাঙ্গাইল-জামালপুর অঞ্চলের বঙ্গাল ভাষার মানুষ এবং রংপুর-কুড়িগ্রাম-গাইবান্ধা অঞ্চলের 'কামরূপী' ভাষার মানুষ -- এদের ত্রহস্পর্শ ঘটেছে। সাথে এরা নিয়ে এসেছে স্বভুমির সংস্কৃতি, আচার ও ঐতিহ্য। এই ত্রিধারার অন্বর্বুনন ঘটছে রৌমারী আর তার আশে পাশের অঞ্চলে।

প্রসঙ্গত উলেখ করি যে সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, মুহম্মদ শহীদুলা প্রমুখ বাংলা ভাষার পণ্ডিতজনেরা বাংলা ভাষায় কয়েকটি উলেখযোগ্য প্রধান উপভাষা বা উপশ্রেনীর আবিষ্কার করেছেন। এই উপভাষাগুলো হ"ছঃ পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় অঞ্চলে কথ্যভাষা 'রাঢ়ী', দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার কথ্যভাষা 'ঝাড়খণ্ডী', পুর্ববঙ্গের (ঢাকাকে কেন্দ্র করে মৈমনসিংহ থেকে বরিশাল পর্যন্ত বিস্তৃত) কথ্যভাষা 'বঙ্গাল বা বঙ্গালী', উত্তর বঙ্গের (রাজশাহীকে কেন্দ্র করে দিনাজপুর থেকে পাবনা পর্যন্ত অঞ্চল) কথ্যভাষা 'বরেন্দ্রী', এবং পুর্ণিয়া'র পুর্বাংশ থেকে জলপাইগুড়ি থেকে সমগ্র উত্তর বঙ্গ ও আসামের গোয়ালপারা পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের কথ্যভাষা 'কামরূপী'। দিনাজপুরে অবশ্য একদিকে বরেন্দ্রী (দক্ষিণাঞ্চলে) ও অন্যদিকে কামরূপীর (পুর্বাঞ্চলে) প্রভাব পরেছে। রৌমারীর উজানী মানুষদের কথ্যভাষা মুলতঃ 'কামরূপী' অন্যদিকে ভাটিয়াদের কথ্যভাষা মুলতঃ 'বঙ্গালী' বা বাঙ্গাল। রৌমারীর সাহসী মানুষেরা এই ভাষাগত সমস্যা কিভাবে কাটিয়ে ওঠে তা দেখবার বিষয়। এককথায় বলতে পারি রৌমারীতে এসে মিশেছে 'ভাওয়াই'র উচুনিচু সুরের সাথে 'ভাটিয়ালি'র দীর্ঘ সমতলীয় একটানা সুর। তাই এখানকার লোকজ সংস্কৃতিতে বিশুদ্ধ কামরূপী ঐতিহ্য খুঁজলে পাঠক হতাশ হবেন। অসমিয়া বা কামরূপী উপভাষার শব্দের প্রাচুর্য ও বাক্য বিন্যাসের প্রাধান্য লক্ষিত হলেও এবং প্রশাসনিক দিক থেকে কুড়িগ্রাম জেলার অন্বর্ভুক্ত হলেও রৌমারীর রয়েছে নিজস্ব লোকজ স্বাতন্য, তা গবেষকদের দৃষ্টি এড়াবে না। এখানে এককালে বয়াতীর গান, কুশাই যাত্রা, গাজীরপট গান, ভাসান যাত্রা, মনসা মঙ্গল প্রভৃতি গানের জনপ্রিয়তা ছিল- আজ তা প্রায় অবলুপ্ত আধুনিকতার স্পর্শে।

তিস্তা ও ধরলা পারের ভাওয়াইয়া গান এখানকার মানুষকে এখনও আনমনা করে তোলে। এ ধরণের গানের একটি নমুনা দেওয়ার লোভ সংবরণ করতে পারছি নাঃ

নাক টিন টিন চেংরি কোনা
আ"ছা সাজিছে
নীল বরিদি কাপড় অংগাইছে

ওরে নীল বরিদি কাপড় অংগাইছে
ওরে ঘাগরি কাঁটি উপার চুরি
হাত দু কোনাত পিন্দিছে।

এই গানটিতে একটি চিকন নাসা কিশোরী মেয়ের সাজসজ্জার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। একেবারেই রংপুরী কথ্যভাষায় রচিত, বিখ্যাত ভাওয়াইয়া শিল্পী মহেশচন্দ্রের। '*চেংরি কোনা*' অর্থ একটি কিশোরী মেয়ে। *টিন টিন* অর্থ তীক্ষ্ণ বা চিকন। '*নীল বরিদি কাপর অংগাইছে*' অর্থাৎ - নীল জল দিয়ে কাপড় রঙ্গিয়েছে। '*উপার চুরি*' অর্থ র"পোর চুরি, আর *পিন্দিছে* অর্থ পরেছে বা পরিধান করেছে। '*হাত দু কোনাত*' অর্থ হাত দুটিতে। পুর্ববঙ্গে, যেমন কুমিল-ায়, 'পিনদন' শব্দ দিয়ে কাপড় পরা বোঝায়। যেমন 'কাপড় 'পিনদনডা'ও শিকছছ না।' দিনাজপুরে পিন্ধা বা পিন্ধা (ক্রিয়াপদ) বলতে কাপড় পরা বোঝায় এবং পিন্ধন অর্থ পরিধান। পণ্ডিতদের মতে সংস্কৃত 'অপিনদ্ধ' থেকে থেকে 'পিনদ্ধ' (পরিধান করা হয়েছ এমন অবস্থা) থেকে পিন্ধা ক্রিয়াপদ তৈরী হয়েছে। (আরও দেখুন ড. মুহম্মদ শহীদুলাহ সম্পাদিত ও বাংলা একাডেমী প্রকাশিত '*বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান*', ১ম খণ্ড, ২য় অংশ, ১৯৬৫, পৃ ১৮৪)। কামরূপী ও বরেন্দ্রী উপভাষায় চ্যাংরা (চ্যাংড়া) শব্দের অর্থ অল্প বয়স্ক ছেলে ছোকরাদের বোঝায়, আর স্ত্রীলিঙ্গে 'চ্যাংরি বা চেংরি'। তবে পশ্চিম বাংলাতেও এই শব্দের বেশ চল রয়েছে। 'চ্যাংড়ামি' অর্থ ছেলেমানুষী।

আমরা যে অঞ্চল ও ভাষা নিয়ে কথা বলছি অর্থাৎ সমগ্র উত্তর বঙ্গের লোক সাহিত্যে ভাওয়াইয়া গান এক অনন্য স্থান অধিকার করে আছে। এখানকার আঞ্চলিক ভাষার একটি বৈশিষ্ট্য হল অন্স্য 'ব' এর উ"চারণ এখনও রক্ষা করে চলেছে অনেকটা 'ওঅ' এর উ"চারণের মত, যেমন এখানকার লোক 'দেব' কে বলে দেও, দেবর কে বলে 'দেওর বা দেওরা'। ঠিক তেমনি 'ভাব'কে উ"চারণ করে 'ভাও'। ভাব শব্দটির অনেক অর্থ আছে যেমন হিন্দু দর্শন ও ধর্মে এর অর্থ হ"ছে সৃষ্টি, জন্ম বা উৎপত্তি; আর একটি অর্থ সত্তা বা অস্তিত্ব। অন্য অর্থগুলি হল - ভালবাসা, মিল, প্রীতি, প্রণয় ইত্যাদি; চিন্া বা ধ্যান নিগুর অর্থ, অন্রের কথা; ভক্তি, আবেশ ইতাদি। ভাবাইয়া থেকে ভাওয়াইয়ার উৎপত্তি হওয়া অসম্ভব নয়- যার অর্থ হলো ভাব থেকে উত্থিত অর্থাৎ 'ভাবোত্থিত'। সুতরাং প্রেম- প্রীতি- প্রণয়, বা গভীর চিন্া-ধ্যান ও মনের আবেগ সম্পৃক্ত সাধারণ মানুষগানগুলো স্বতঃস্ফুর্তভাবে যে সব গান রচনা করত ও গাইত সে সব গানই পরিচিতি লাভ করে ভাওয়াইয়া নাম।

প্রসঙ্গত রংপুরাদি অঞ্চলে কথিত কামরূপী উপভাষার ক'টি বৈশিষ্ট্য উলেখ করি। প্রথমত এ ভাষায় জনগণ উ"চারণে প্রায়শ অচেতনভাবে র'কে 'অ' আর 'অ বা উ'কে 'র' এবং 'র"' উ"চারণ করে থাকে। যেমন রংপুরকে উ"চারণ করা হয় অংপুর, আর উকিল বাবুকে লোকে বলে 'র"কিল' বাবু। তবে রংপুরের ভাষাকে দোষ দেয়া হলেও আমি বরিশাল সহ দক্ষিণবঙ্গে এমনকি কোলকাতার আশেপাশের দেহাতী মানুষদের মধ্যেও এ ধরণের প্রবণতা দেখেছি। উত্তর বঙ্গের কোন স্থানে ল 'ন'এ এবং ন 'ল'য়ে পরিণত হয়- যেমন লাঙ্গল > নাঙ্গল, নিয়ে > লিয়ে ইত্যাদি। আমি স্থলে মুঁই, আমার স্থানে 'মোর' এর ব্যবহার লক্ষ্যণীয়, তবে এই বৈশিষ্ট্য কেবল বরেন্দ্রী আর কামরূপী উপভাষার নয়; পশ্চিম বঙ্গ ও দক্ষিণ বঙ্গের কথ্যভাষাতেও এই বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। কামরূপী উপভাষার আর একটি লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট অধিকরণ কারকে (৭মী) এ-কার ব্যবহার হয় না হয়ে 'ত' প্রয়োগ হয়। যেমন 'লাল বুড়ি হাটত যায়' অর্থাৎ 'লাল বুড়ি হাটে যায়' বা 'আমি বাড়ী যা"ছি' > মুঁই বাড়ীত যাছোঁ। বাংলায় নেতি বাচক 'না' সাধারণত ক্রিয়াপদের পরে বসে, কিনতু সংস্কৃত বা প্রাকৃতে ক্রিয়াপদের আগে বসে। কামরূপী উপভাষার

এই বৈশিষ্ট এখনও বহন করে চলছে। উদাহরণ: 'যাই না' (বাংলা} < 'না খাই' (কামরূপী) < ' ন খাদতি' (সংস্কৃত)।

এরই পাশে রৌমারীতে এখন অবধি যে সব গান বিয়ে উপলক্ষ্যে গাওয়া হয়, তার একটি নমুনা তুলে ধরছি ঃ

এতো সুন্দর দামান গো তুমি
মুখে নাই ক্যান হলোদি
মায়ের প্যাডের নাইগো বোন
কাঁঞবা দিবো হলোদি।
এতো সুন্দর দামান গো তুমি
মুখে নাই ক্যান হলোদি
নাইক্যা গো বড় ভাবী
কাঁঞবা দিবো হলোদি।
(সমর পাল সংগৃহীত, *লোকসাহিত্যে রৌমারী*, ১৯৮৮)

বঙ্গালী উপভাষায় 'দামান' হল ননদের স্বামী। রৌমারীতে যে মিশ্র সংস্কৃতি যে গড়ে উঠছে এই গানটি তার উদাহরণ। মোটামুটি কামরূপী ভাষায় রচিত হলেও বঙ্গালের প্রভাবও লক্ষ্যণীয়। নাইগো যেমন উত্তর বঙ্গে যেমন ব্যবহৃত হয়, তেমনি 'নাইক্যা' সাধারণভাবে পুর্ববঙ্গে প্রচলিত। 'কাঁঞবা' অর্থ কেই'বা; এটি একেবারেই রংপুরী-কামরূপী ভাষায় ব্যবহৃত শব্দ। শব্দটি নানাভাবে উ"চারিত ও বানান করা হয়ে থাকে। যেমন দিনাজপুরের কথ্যভাষায় 'কাঁয়' বা কাঞ অর্থ 'কে'। 'ওকে নিয়ে কে যাবে?' বাক্যটি দিনাজপুরের কথ্যভাষায় বলা হবে : 'উমাক কাঁয় নিয়া যাবে ?'। 'হলোদি' শব্দটির প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাক। চলতি বাংলায় আমরা বলি হলুদ। উত্তরবঙ্গে হলদি ও হলুদ দুটি শব্বই চালু, তবে কথ্যভাষায় হল্‌দি অধিক ব্যবহৃত। সম্ভবত রৌমারীতে এটি উ"চারিত হত হলুদি। হলদি শব্দটি উদ্ভুত হয়েছে সংস্কৃত হরিদ্রা থেকে : হরিদ্রা (সং) > হলিদ্দা (প্রাকৃত) > হলদি > হলুদ। আমরা জানি মৈমনসিংহ-কুমিলাসহ পুর্ববঙ্গের অনেক অঞ্চলে উ-কার 'ও-কারে' আর, ও-কার 'উ-কারে' রূপান্‌রিত হয়- যেমন চোর উ"চারিত হয় চুর হিসেবে, আর র'মানা পরিণত হয় 'রোমানা'য়। একই ভাবে বঙ্গাল উপভাষার প্রভাবে হলুদি গায়কের হাতে পরিণত হয়েছে 'হলোদি'তে। 'প্যাডের' কথাটিও বঙ্গাল প্রভাবিত- রংপুরাদি অঞ্চলে বলা হবে 'প্যাটের' (পেটের)। রৌমারীর আর একটি লোক সঙ্গীতেরইনদর্শন দিই:

আহারে এ দ্যাশের চেংরীর ভাতার নাইরে
বন্ধুর বাড়ী আমার বাড়ী মধ্যে হাটু পানি
আসতে যাইতে কাপড় ভিজে
গাল পাড়ে সোয়ামী।
আহারে এ দ্যাশের চেংরীর ভাতার নাইরে
বন্ধুর বাড়ী আমার বাড়ী মধ্যে নলের বেড়া
হাতাহাতি পান দিতে
দেখলো ছোট দ্যাওরারে।

আহারে এ দ্যাশের চেংরীর ভাতার নাইরে ...
(সোহরাব হোসেন সংগৃহীত ও গীত)

রৌমারী থেকে প্রত্যাবর্তন

অসংখ্য সুখস্মৃতি আর অনাবিল আনন্দ নিয়ে, এবং অনেক নতুন বন্ধুলাভের মধ্যদিয়ে ফিরে এলাম সেখান থেকে। এর মধ্যে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে রৌমারীতে গঠিত নগর কমিটির সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা এবং রৌমারী সি. জি. জামান হাইস্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক আমারই সমবয়সী জনাব আজিজুল হকের সাথে তাঁর বাসভবনে দীর্ঘক্ষণ সান্ধ্য আলোচনা আমার স্মৃতিকোঠায় উজ্জল থাকবে। আর মনে রইবে যে সাহসী যুবকটি আমাকে তার মোটর বাইকে চড়িয়ে নিরাপদে ফিরিয়ে এনেছিলেন রৌমারীতে, তাঁর কথা।

ফেরার পথে পাথরের চর ফেরিঘাট পেরিয়ে দেখে এলাম কামালপুরে স্থাপিত বীর মুক্তিযোদ্ধা কর্ণেল তাহের ও তার সঙ্গী মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতিতে নির্মিত সুন্দর স্মৃতি সৌধ - যেখানে খোদিত হয়েছে কামালপুরের যুদ্ধে তাঁর বীরত্বের কথার সাথে সকল শহীদের নাম। কামালপুরের যুদ্ধ আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সাফল্যের এক উজ্জল মাইলফলক। কিন্তু সেকথা, কামালপুরের যুদ্ধ আর মুক্তি যুদ্ধে রৌমারীর ভুমিকার কথা, আর একদিন বলব।

অজয় রায়ঃ weÁvbx, cvewÜK I wekwe`¨vj‡qi Aemi cÖß Aa¨vcK, মুক্ত-মনার সক্রিয় সদস্য।